পর্যায়-৩

একক ১ □ রবীন্দ্রসাহিত্য

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ প্রস্তাবনা ঃ রবীন্দ্র কাব্য-কবিতা

১.৩ পাঠ ও আলোচনা

- ১.৩.১ প্রথম পর্ব
- ১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব
- ১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব
- ১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব
- ১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব
- ১.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব
- ১.৩.৭ সপ্তম পর্ব
- ১.৩.৮ অষ্টম পর্ব

১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

বাংলাসাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচারে আধুনিক যুগলক্ষণের সূত্রপাত ১৯ শতক। মধুসূধনের মধ্য দিয়ে নবজাগ্রত বাঙালিসমাজের সাহিত্যবোধ আধুনিকতার আলোকে উদ্দীপ্ত হল। সেই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ক্ল্যাসিক রীতির পরিবর্তে রোম্যান্টিক গীতিময়তার যে সূচনা বিহারীলালে, তার পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রনাথে। প্রথমত ও প্রধানত কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোকসামান্য প্রতিভার সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রেখে গেছেন স্বর্ণালী স্বাক্ষর। কবিতা, গান, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ এমনকি চিঠিপত্রেও তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও মনীষার বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যসভায় মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিংশশতাব্দীর প্রথম থেকে যে সাহিত্যযুগ শুরু তাকে বলতে পারি রবীন্দ্র-রেনেসাঁস সমৃদ্ধ রবীন্দ্রযুগ।

১.২ প্রস্তাবনা : রবীন্দ্র কাব্য-কবিতা

'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয় আমি কবি মাত্র।"

এই উক্তির প্রেক্ষিতেই আমাদের মনে পড়তে পারে রসজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তি—"কাব্য সাধনাই রবীন্দ্রনাথের আজন্ম সাধনা এবং কাব্য সাধনাই তাঁহার জীবন সাধনাও বটে।" একারণেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বীকারোক্তি আবারও মনে পড়ে যায়—

"কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী"

তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত কালপর্বে এই 'বহুকালের প্রেয়সী' কবিতা বারবার নানা রূপে-রূপান্তরে ধরা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক গীতিকবি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আকর্ষণ, গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, মর্ত্য ধূলির প্রতি মমতাময় আসক্তি ও মানবজীবনের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা প্রকাশিত, সেইসঙ্গে রোম্যান্টিক বিষাদ ও বেদনার অনুভব যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ কাব্যের। কল্পনা ও অনুভূতির রসসঞ্চারে তাঁর কাব্য যথার্থই রসাত্মক কাব্য হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রপূর্ব যুগে মধুসূদনের মধ্য দিয়ে যে ক্ল্যাসিক রীতির মহাকাব্য রচনার ধারা শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে এসে তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হল। প্রাথমিকভাবে বিহারীলালের কাব্যেই সেই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম দেখা মেলে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তার পূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের মিষ্টিক কবি বিহারীলালের কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম অনুভব করেছিলেন কাব্যের অন্তর্লীন সুর ও আবেগ। তাঁর কাব্যেও আমরা উপলব্ধির ক্রমপর্যায়ে দেখি রোম্যান্টিক চেতনা তেকে প্লেটোনিক ভাবনা ছুঁয়ে গিয়ে মিষ্টিক ভাবকল্পনায় কবিতা মুক্তি পেয়েছে এবং এভাবেই তা সীমা থেকে অসীমে, রূপ থেকে ভাবে বিকশিত হয়েছে।

তাঁর প্রথম কৈশোর থেকে পরিণত বয়স অতিক্রম করেও তিনি নিত্য নবভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন—তাঁর কবিতার মধ্যে রয়ে গেছে নবনব সৃজনশীলতার স্বাক্ষর। তাঁর তেরো বছর বয়স থেকে মৃত্যুকালীন আশি বছরের প্রাপ্ত সীমায় পৌঁছেও তিনি কাব্য রচনার অক্লান্ত পথিক।

১.৩ পাঠ ও আলোচনা

১.৩.১ প্রথম পর্ব

তাঁর কাব্যের আদিপর্বে আছে কবিকাহিনী, বনফুল, শৈশবসঙ্গীত।

কবিকাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এ কাব্য সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন

"যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।"

এটিকে ট্র্যাজিক রোম্যান্স আখ্যা দিয়েছেন সমালোচকবৃন্দ। কবির মতে "ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে।"

'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা, তাঁর তেরো বছর বয়সে রচিত এ কাব্য অবশ্য গ্রন্থাকারে 'কবিকাহিনী'র পরে প্রকাশিত হয় (১৮৮০ খ্রিঃ)। এরও আগে কিশোর কবি রচনা করেছিলেন "পৃথ্বীরাজ পরাজয়"—যদিও নিজেই সেই রচনাকে সাহিত্যপদবাচ্য করতে পরে অস্বীকার করেন। 'বনফুল' কাব্যে রচিত একটি গল্প, বিশ্বজীবন ও মানবজীবনের সুগভীর বন্ধনকে রবীন্দ্রনাথ বারবার নানাভাবে তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য কোরকেই সেইভাবে প্রকাশিত। প্রাথমিক পর্যায়ের এই রচনার মধ্যেই ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ লীরিক কবির রোমান্টিক মন্ময়তা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল। এই আবেগধর্মী, গীতিময় ভাবনারই প্রকাশ পরবর্তী 'শৈশবসঙ্গীত'। হৃদয়-উচ্ছ্বাসের তীব্র মধুর রোম্যান্টিক বেদনাভরা এ গ্রন্থের গাথাগুলি

প্রায় সবই ট্র্যাজেডি। এগুলিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের লীরিক রচনার প্রয়াস বলা যায়। বনফুল থেকে শুরু করে এ পর্যায়ের সব রচনাতেই এই সুরের আভাস।

'বনফুল' কাব্যে দেখেছি বনপ্রকৃতিতে পালিতা কমলার প্রেমের বেদনাঘন পরিণতি। বনাঞ্চলের বালিকা লোকালয়ে নিজেকে মেলাতে না পেরে ব্যর্থ প্রণয় বেদনা বুকে নিয়ে বনপ্রকৃতিতে ফিরে এসেও জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল না। মৃত্যুতেই তার প্রেমের সমাপ্তি। কমলা, বিজয়, নীরদ, নীরজা ভালোবাসার আলো আঁধারিতে চারটি বেদনাম্লান চরিত্র। বিবাহিত জীবনের সঙ্গে মুক্ত প্রেমের এই সংঘাত, যা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনায় বহুবিচিত্ররূপে প্রকাশিত তার সূচনা 'বনফুল' কাব্যের কমলা চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। মানবজীবন ও প্রকৃতি—সীমা ও অসীমের মিলন সাধনের এই পালাই রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের মূলসুর। এই সংযোগ সার্থকতা হওয়ার বিষাদমগ্ন এক তত্ত্বময়তা এ পর্যায়ের কাব্যগুলিতে প্রকাশিত।

"নিশীথে আঁধার নাই, আলোকে তীব্রতা নাই
কোলাহল নাইক দিবায়
আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত
তৃপ্তি নাই মাধুর্য শোভায়"

বনফুলের মত 'কবিকাহিনী'র মধ্যেও রোম্যান্টিক বেদনার তীব্রতা অকারণ বিষাদ ও শূন্যতাবোধ, অতৃপ্তির যন্ত্রণাবোধ লক্ষ্য করি।

"এখনো কহিছে কবি 'আরো দাও ভালোবাসা
আরো ঢালো ভালোবাসা হৃদয়ে আমার'
প্রেমের অমৃত ধারা এত যে করেছ পান
তবু মিটিল না কেন প্রণয় পিপাসা?"

'কবিকাহিনী'র কবি যেন রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ পরিবর্তিত ছায়াভাস। একাব্যের নায়িকা নলিনীর মৃত্যুতে কবির মনে এসেছে সংশয়। এই সময় থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে রবীন্দ্রমানসে, জীবনের ট্র্যাজেডি ও দুঃখবোধের জিজ্ঞাসা জেগেছে মৃত্যুতেই কি শেষ না দুঃখ উত্তীর্ণ এক অতীন্দ্রিয় চেতনার বিকাশ সম্ভব—এই দোলাচল প্রশ্ন প্রেমিকার মৃত্যুতে কবি উচ্চারণ করেছেন—

"গিয়াছে কি আছে বসে
জাগিল কি ঘুমাল সে
কে দিবে উত্তর?"

'শৈশবসঙ্গীতের কবিতাগুলিতেও এই অকারণ বিষাদ অনুত্তর প্রশ্ন Ramantic Agony-র সুর ধ্বনিত,

"ওগো দেবী, ওগো বনদেবী
বল মোরে কি হয়েছে মোর
কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুম ঘোর"

শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থাকারে প্রকাশকালের হিসাবে সন্ধ্যাসংগীতের অনুজ হলেও রচনাকালের দিক দিয়ে অগ্রজ। এর অধিকাংশ কবিতাই ১২৮৪-১২৮৭ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭৮-৮৯) ভারতীতে মুদ্রিত হয়েছিল।

১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাসংগীত'। এই কাব্যটিকে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা বলা যেতে পারে। 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> "আমার কাব্য রচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব, সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।"

এ কাব্যের কবিতাতেও বিষাদের সুর ধ্বনিত। কবিতাগুলির নামকরণেই বেদনা ও দুঃখের ছায়াপাত ঘটেছে—সন্ধ্যা, আত্মহারা, আশার নৈরাশ্য, পরিত্যক্ত দুঃখ আবাহন, তারকার আত্মহত্যা ইত্যাদি। এই সময়কার অস্থির বেদনাই কবিতাতে ধ্বনিত। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে রোম্যান্টিক বিষাদের ভাবোচ্ছ্বাস ও বেদনাব্যাকুল দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পথহারা পথিকের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন হৃদয় অরণ্যে।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রভাতসংগীত' যেন সন্ধ্যাসংগীতের পরিপূরক। এক দুর্লভ প্রভাতীক্ষণে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটলো—সন্ধ্যার ছায়াম্লান হৃদয়ের বেদনার আঁধার থেকে আনন্দের দিব্যবিভায় কবির মুক্তি ঘটলো। প্রভাতসংগীতের জ্যোতির্ময় প্রভাতে সন্ধ্যায় ম্লানিমা দূর হলো। বাহির ও অন্তর যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে কবির অন্তরে ছিল, ততদিন তাঁর উপলব্ধি পূর্ণ ও সার্থক হয়নি। এই সামঞ্জস্যের অভাবেই কবিচিত্তে বিষাদ ও বেদনা ঘনীভূত হয়েছিল। যতদিন না নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটলো, ততদিন এই বেদনার আঁধার তাঁর চিত্তের সংশয় মোচন করতে দেয়নি। যে আঁধার আলোর অধিক,সেই বেদনার অন্ধকারে সন্ধ্যাসংগীতের সৃষ্টি আর সেই বেদনার আঁধার থেকে যে আলোর জন্ম সেই দিব্য প্রভাতের পরম প্রজ্ঞায় প্রত্যয়দৃঢ় 'প্রভাতসংগীতে'র প্রকাশ। সন্ধ্যাসংগীতের হৃদয়-অরণ্য থেকে প্রভাতসংগীতে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে আপনসত্তার অনুভব উচ্চারিত হল।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, যদিও এটি কবির যোলো বছর বয়সের রচনা। কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের রোম্যান্টিক মন্ময়তা অনুরাগী ও অনুসারী ছিলেন। তাঁর কথায় বিহারীলালের আত্মগত লীরিক ধর্মিতা প্রকাশিত—

> "আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ
> সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই।"

এই রোম্যান্টিক ভাবগত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রমানসে বৈষ্ণবপদাবলীর-ও সুগভীর প্রভাব ছিল। তারই প্রকাশ—ভানুসিংহের পদাবলী। বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুকরণে ব্রজবুলির অনুসারী এক কবিভাষায় এই কাব্যের পদগুলি রচিত। এর কয়েকটি পদ কিশোর কবির অনুপম সৃষ্টি, যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজে উত্তরকালে এর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

> "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গানের বিলাতি টুংটাং মাত্র।"

১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—'ছবি ও গান'। শৈশব ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে রচিত এই কবিতাবলীতে কবির নিজের কথায়—"ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বেকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে দিন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না,রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে।" তাই 'ছবি ও গান'-এ আছে চিত্রধর্মিতা ও গীতিধর্মিতা। এতে আছে যৌবনচাঞ্চল্যের ছবি, আছে যৌবনবেদনার গান, রূপ নিয়ে ছবির সৃষ্টি আর ভাব নিয়ে সৃষ্টি হয় গান। যৌবনের রক্তিম কামনার সঙ্গে মিশে যায় সুরের মুর্ছনা। তাই 'ছবি ও গানে'র কয়েকটি কবিতা যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা নিখুঁত ছবি—

'সুখস্বপ্ন', 'পূর্ণিমায়', 'সুখের স্মৃতি' তার বিশিষ্ট নিদর্শন। আবার 'জাগ্রতস্বপ্ন', 'স্মৃতিপ্রতিমা' কবিতায় অস্ফুট গীতিমূর্ছনার বেদনা আভাসিত। দূর থেকে দেখা ছবি আর দূর থেকে শোনা গানকে তিনি ব্যাকুল ভাষায় বাঁধার প্রয়াসী হয়েছেন—

"কেহ কি আমারে চাহিবে না
কাছে এসে গান গাহিবে না?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা?"

স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে এ কাব্যের কবিতাগুলি ললিত মধুর। এরগ মধ্যে নবযৌবনের উল্লাস যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন—"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কী মাতাল হয়ে লিখেছিলুম—আমি তখন দিনরাত পাগল হয়েছিলুম। সত্য কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।"

'বনফুল', 'কবিকাহিনী' থেকে ছবি ও গান পর্যন্ত কাব্যরচনার ইতিহাসকে বলা চলে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্য। প্রেম ও প্রকৃতিচেতনা তখন এক আত্মগতভাবে লীন হয়েছিল। প্রেম কেবল যেন এক আত্মিক অনুভূতি। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে একটা তাত্ত্বিক আবরণ দেবার প্রয়াস এই প্রথম পর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই তত্ত্বময়তা অবশ্যই বিহারীলালের প্রভাবসঞ্জাত। প্রথম পর্বের এই একান্ত আত্মগত ভাবের শেষে 'কড়ি ও কোমলে' কবি যেন আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ উপলব্ধি করলেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হল্লায়। এর একদিকে আছে সন্ধ্যাসংগীত পর্বের আধো আলোছায়া, অন্যদিকে আছে 'মানসী'র স্বচ্ছ অরুণাভা। একদিকে নবযৌবনের উন্মেষ অন্যদিকে প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ—তাই প্রথম পর্যায়ের শেষ অথবা নবপর্যায়ের সূচনা হিসেবে 'কড়ি ও কোমল' বিশিষ্ট এক মিশ্ররসের কাব্য। কবির নিজের ভাষায় 'আত্মপ্রকাশের প্রবল আবেগ' আর 'বহিদৃষ্টিপ্রবমতা' এই প্রথম তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। এই প্রবল আবেগ থেকেই তীব্র বাসনা রঙীন সনেটগুচ্ছ লেখা হয়েছে। নারীদেহ-সৌন্দর্যকেন্দ্রিক কবিতাগুলি রবীন্দ্রসৃষ্টি সম্ভবারে এক নতুন সংযোজন। অনুভূতির তীব্রতার উষ্ম আবেগচঞ্চল এই দেহাশ্রয়ী সনেটগুচ্ছেও কিন্তু দেহাতীত গভীরতরে স্পর্শ অনুভব করা যায়। প্রকৃতির বিশালতায় ব্যক্তিমানসের মুক্তি আভাসিত 'যৌবনস্বপ্ন' কবিতায়—

"আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ" সৌন্দর্যকে এভাবেই কবি বিশ্বলীলার ছন্দে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। নবযৌবনের স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছলতায় নারীদেহাশ্রয়ী সনেটগুচ্ছেও এই মুক্তির কথা প্রচ্ছন্ন। প্রেমের তীব্রতাকে তিনি 'পূর্ণিমা রাত্রি' বলে তারগ থেকে মুক্তি চাইছেন ঊষার আলোকে মুক্তির আকাশে—

"কোথায় ঊষার আলো, কোথায় আকাশ
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক অবসান"

'কড়ি ও কোমলে' এই যৌবন চাঞ্চল্যের সঙ্গে আর একটি বিষয় ধরা পড়েছে—সেটি জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। কবি বলেছেন—"যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

মৃত্যুর আঘাতে কবিচিত্তের বেদনা উৎসারিত, কিন্তু তাঁর ভাবনার বৈশিষ্ট্যই জীবনের সচলছন্দে তাল মেলানো। তাই দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি অন্তত প্রাণপ্রবাহে জীবনের স্পন্দন উপলব্ধি করতে চান। 'কড়ি ও কোমলে' মর্ত্যপ্রীতি, জীবনবোধ ও যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।

এতদিনকার কাব্যে যে অকারণ বেদনার আভাস ছিল—এবার তাই খুঁজে পেয়েছে উৎসমুখ। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে কবি যেন জীবনের পাত্রকে পূর্ণ উপলব্ধি করলেন। তাই মৃত্যুর তরঙ্গঘাতে যে কবিতার জন্ম, তার নাম দেন 'প্রাণ'।

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্য সভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার"

১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব

রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম সার্থক সৃষ্টি' বলে সমালোচকবৃন্দ বন্দিত করেছেন 'মানসী'-কে ১৮৮৭ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এর কবিতাগুচ্ছ গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে। গাজিপুরের নির্জনবাসে এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা রচিত। এছাড়া কলকাতা, শান্তিনিকেতন, সোলাপুর ও লণ্ডনে রচিত একটি কবিতাও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। 'মানসী' বাংলাকাব্যের আনন্দ বিস্ময়। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ এ কাব্যেই স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে। 'মানসী'-কে রবীন্দ্রনাথের মানস পরিণতির প্রথম সার্থক প্রকাশ বলা যায়। তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলভাব মানসীতেই প্রথম প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে।

'মানসী' নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। কবি মানসের প্রেমকল্পনাই মানসপ্রতিমা। তার অধিষ্ঠান কবির মনোলোকে। ভাবকল্পনায় গড়া সেই মানসী সীমার বন্ধন-উত্তীর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুরী। সীমার মধ্যে অসীমের প্রতিভাস 'মানসী' কাব্যের মর্মবাণী। কবি বলেছেন—

"আমি ভালোবাসি অনেককে, কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি, সে মানসেই আছে,
সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কী?"

"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের"—এই পরম উপলব্ধি 'মানসী' কাব্যের প্রেমকবিতাকে ঘিরে আছে প্রেমের রূপ নয়, তার আত্মার অনুসন্ধান মানসী মূল কথা। তাই বাস্তবের সঙ্গে আদর্শায়িত প্রেমকল্পনার বিরোধাভাসের চকিত চমক—

"সমগ্র মানব তুই পেতে চাস
একী দুঃসাহস
কী আছে বা তোর
কী পারিবি দিতে
আছে কি অনন্ত প্রেম?"

'মানসী'র 'নিষ্ফলকামনা' কবিতাটিতে সমগ্র কাব্যের ভাব বিধৃত বলে মনে হয়। আদর্শায়িত প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্ব জনিত বেদনার তীব্র মধুর বাণীরূপ 'নিষ্ফলকামনা'। দেহাতীত প্রেমভাবার মুক্ত মাধুরী এ সময়কার বিভিন্ন রচনায় ধরা পড়েছে।

প্রেমের এই কামনাহীন অনুভবের গান— 'সুরদাসের প্রার্থনা'। এ কবিতার পূর্ব নাম ছিল 'আঁখির অপরাধ'। মোহময় দৃষ্টি দিয়ে প্রেমের রূপারতি যথার্থ প্রেম নয়, তাতে আছে ভোগের স্থূলতা। সেই অপরাধ থেকে মোহমুক্ত উদার দৃষ্টিতে প্রেমের প্রকাশ ঘটুক এই প্রার্থনাই কবিতাটিতে ধ্বনিত।

"আঁখির সহিত আঁখির পিপাসা
লোপ করো একেবারে"

—স্বদেশ, সমাজ ও জাতীয় জীবনের অনুভূতি ও ভাবনা সঞ্জাত কিছু কবিতাও 'মানসী'তে আছে। 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'গুরু গোবিন্দ, 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমলাপ' ইত্যাদি কবিতাগুলি এই পর্যায়ভুক্ত।

'মানসী'র নিসর্গ কবিতাগুলিতে কবিমানসের সার্থক সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। 'একাল ও সেকাল', 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় পুরাণ প্রতিমা থেকে কালিদাসের কাল ফিরে এসেছে পাঠকের মনোলোকে।

অন্তরঙ্গ কাব্যভাবনার সঙ্গে 'মানসী'তে বহিরঙ্গ প্রসাধনাও নবরূপে প্রকাশিত। কবির নিজের কথায়—"মানসীতেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল"।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে "সোনারতরী" কাব্যের স্মরণীয় প্রকাশ। এই কাব্য থেকেই শুরু হলো তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির বৈচিত্র্য। প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনের কাব্য সোনারতরী। এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।.....আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

জমিদারির কাজে পদ্মাবিধৌত বঙ্গে শিলাইদহ-পতিসর-পাবনা অঞ্চলে কবি এসময় বোটে করে ভ্রাম্যমান।

বাংলাদেশের উদার প্রান্তর, অসীম অম্বর, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের বরণচাতুরী—তাঁর এসময়ের লেখায় ধরা পড়েছে। ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিতে যে নিসর্গ মাধুরী মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ, সমকালীন গল্পগুচ্ছে মানুষের নিবিড় পরিচয়ের আভাস—তারই ছায়াপাত 'সোনারতরী' কাব্যের কবিতাবলীতে।

প্রকৃতির সঙ্গে জন্মান্তরের বন্ধনের কথা, আত্মিক যোগের কথা 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধ্বনিত। এছাড়া একাব্যেই একাধারে রয়েছে মরণপীড়িত চিরজীবী প্রেমের অমরভাষ্য 'যেতে নাহি দিব', সীমা-অসীমের তত্ত্বপ্রকাশক 'দুই পাখী', চিরঅন্বেষাময় জীবনসাধনা 'পরশপাথর' অসামান্য মৃত্যুচেতনা ঋদ্ধ 'প্রতীক্ষা' ও 'ঝুলন' এবং কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় 'সোনারতরী' ও 'নিরুদ্দেশযাত্রা'। এই সঙ্গে রয়েছে বিশুদ্ধ প্রেমকবিতা 'দুর্বোধ', 'লজ্জা', 'হৃদয়যমুনা' এবং কবির আজন্মসাধনার ধন—'মানসসুন্দরী'। সমালোচকের ভাষায়—"মানসীতে যে ছিল অস্পষ্ট ও অন্তরালবর্তিনী, মানসসুন্দরীতে তারই প্রতিমা রচিত হল।" বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য মধুরিমাই কবির মানসসুন্দরী। এই মানস প্রতিমাই তাঁর কাব্যলক্ষী। তাঁর আজন্মসাধনার ধন। একে কেউ বলেছেন সৌন্দর্য দেবতা, কেউ বা কাব্য দেবী, কেউ বা মানস প্রতিমা। এ কবিতা কবির সঙ্গে কবিতার প্রেমলীলার ছন্দবাণী। কবিতাকে উদ্দেশ করে কবিতা রচনার এই রীতি পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। শেলীর 'হিম টু ইনটেলেকচুয়াল বিউটি'-র কথা এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসবে। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়ন' এ-ও এই অন্তরতমা আপন মানসলোকবাসিনী সত্তার সঙ্গে কথোপকথন।

'সোনারতরী' কাব্যের প্রথম কবিতার নামেই সমগ্র কাব্যের নামকরণ। সুতরাং নাম-কবিতাটির তাৎপর্য সমধিক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় 'তরী বোঝাই' শীর্ষক রচনায় বলেছেন—

> "সোনারতরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। এই উপলক্ষে তার একটা মানে বলা যেতে পারে। মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করে চলেছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মত, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত। ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফসল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু মানুষ যখন বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো—তখন সংসার বলে—তোমার জন্য জায়গা

কোথায়? প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকে চিরন্তন করে রাখতে চাইছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।"

এর প্রথম কবিতা 'সোনারতরী' রচিত হয়েছিল ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে এবং শেষ কবিতা 'নিরুদ্দেশযাত্রা' রচিত হয় ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। দুটি কবিতাতেই নৌকাযাত্রার কথা, দুটিতেই তরণীর নেয়ে আছে, তবে 'সোনারতরী'-তে সে আড়ালে আর 'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় সে কবির পথ নির্দেশিকা—অজানা সুন্দরী। রোম্যান্টিক কবিমানসের অকুলযাত্রাই এখানে সূচিত।

'সোনারতরী' লৌকিক প্রেমের কাব্য বলে পরিচিত। কবি সুগভীর প্রীতির বন্ধনে ধরণীর সঙ্গে আপন অস্তিত্বের বন্ধনকে উপলব্ধি করছেন। 'বসুন্ধরা', 'যেতে নাহি দিব', 'অক্ষমা', 'আকাশের চাঁদ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'দরিদ্রা' প্রভৃতি কবিতায় নানাভাবে এই মর্ত্যপ্রীতি সঞ্চারিত, 'বসুন্ধরা' কবিতায় একদিকে বসুন্ধরা, অন্যদিকে মানুষের মুখপাত্র কবি। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার একদিকে বিদায়কামী পিতা, অন্যদিকে তাঁর শিশুকন্যা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয় দুটি ভিন্ন হলেও এদের অন্তর্লীন সুর একই। দুটিতেই লৌকিক প্রেম, মর্ত্যপ্রেমের অমলিন মাধুরী প্রকাশিত। লৌলিক জীবনের চরমতম সত্য—বিদায় গ্রহণ। এই বিদায় কখনো সাময়িক বিচ্ছেদ, কখনো বা মৃত্যু। এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে সবচেয়ে গভীরকথা 'যেতে নাহি দিব'। এই ভালোবাসার বন্ধন ও আকুল আর্তি সত্ত্বেও একদিন চলে যেতে হয়। সেই বেদনাই 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অবয়বে করুণ লাবণ্যের মত ছড়িয়ে আছে।

মর্ত্যপ্রীতির নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে 'আকাশের চাঁদ' কবিতায়। অলৌকিক অবাস্তব বস্তুর জন্য, অপ্রাপনীয়ের জন্য মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা, ক্ষ্যাপা যেমন পরশপাথরের সন্ধানে ঘুরে মরে—জীবনের মধ্যে লুকোনো অমৃতপরশের সন্ধান পায়না, তেমনি বাস্তব সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে অমর্ত্যমাধুরীর সন্ধানে মানুষের জীবন ব্যর্থ পরিক্রমায় শেষ হয়ে যায়।

'সোনারতরী' পর 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যে প্রেমের সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রকাশিত। 'সবুজপাত্র' রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনা আমার মনে সুখদুঃখ বিরহ-মিলন পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী"

—এই নিরাকার সৌন্দর্যতত্ত্বই রূপ পেয়েছে 'চিত্রা'র 'উর্বশী' কবিতায়। ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভব সৌন্দর্যের অখণ্ড অনন্ত সতার প্রতীকিত বাণীমূর্তি উর্বশী।

চিত্রা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের স্মরণীয় প্রকাশ। কবি সমগ্র কাব্যযুগ ধরে যে অন্তরতমের সন্ধান করেছেন, কবির সেই অন্তরতম সত্তাই তাঁর জীবনদেবতা। 'সোনারতরী' থেকে যে নিগর্স অনুভূতি তাঁর চৈতন্যলোকে প্রবাহিত ছিল, তাকেই চিত্রায় এনে পরিপূর্ণরূপে কবি অনুভব করলেন। সেই প্রত্যয় তাঁর অন্তরকে ঐশ্বর্যদান করলো, সেই সত্যই তাঁর অন্তরতম জীবনদেবতা অন্তর্যামীর সন্ধানে তাঁর যে মানসযাত্রা তা-ই পরিণতিতে এসে পৌঁছলো জীবনদেবতা তত্ত্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যে কবি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"

নিজের জীবনের মধ্যে যে আবির্ভাবকে তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন, তিনিই তাঁর জীবনদেবতা। চিত্রাকাব্যের অন্তর্যামী, কৌতুকময়ী, অন্তরতম—সবই সেই জীবনদেবতার বিভিন্ন ও বিচিত্র লীলা। এই জীবনদেবতা ভাবনার সঙ্গে মিশে রয়েছে নিসর্গ প্রকৃতি। নিসর্গের অপার রহস্যময়তা জীবনদেবতা তত্ত্বে মিশে গেছে—তারই

প্রকাশ 'সিন্ধুপারে' কবিতা। 'সিন্ধু'—জীবনসমুদ্র, তারই পারে—অর্থাৎ জীবন উত্তীর্ণ মৃত্যুলোকে জীবনদেবতার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

চিত্রার সৌন্দর্যবিষয়ক কবিতাগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির অনুভবে বিচ্ছেদের বেদনাতেই প্রেমের মধুরিমা, প্রেমের পূর্ণতা। তাই স্বর্গীয় প্রেমে নয়, অলৌকিক সৌন্দর্যে নয়, দুঃখময় পার্থিব প্রেমে ও লৌকিক সৌন্দর্যে কবির অনুরক্তি। চিত্রা সেই লৌকিক সৌন্দর্যের কাব্য। এই সৌন্দর্যমূর্তি একাধারে বিচিত্ররূপিনী অথচ অন্তরব্যপিনী রূপে কবিমানসে লীন হয়ে আছে সৌন্দর্যকে কবি সকল মানব সম্বন্ধের বিকার থেকে সংকীর্ণ সীমার প্রয়োজন থেকে বিশুদ্ধ অখণ্ড মূর্তিতে দেখতে চান। উর্বশী ও বিজয়িনী কবিতায় তার চরম প্রকাশ, ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য মুগ্ধতা ও ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যধ্যান একে দেহে মিলে গিয়ে পূর্ণ সৌন্দর্যের অখণ্ড মঙ্গলমূর্তি সৃষ্টি করেছে। 'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যেন Beauty mystic কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

'জ্যোৎস্নারাতে' ও পূর্ণিমা কবিতা দুটিও কবিচিত্তের সৌন্দর্য লীলাকেই বাঙ্ময় করেছে। অন্তর্জগতে অনুভূত সৌন্দর্যসত্তাকে জ্যোৎস্নারাতে কবিতায় করি আহ্বান করেছেন।

'বিজয়িনী' কবিতায় সৌন্দর্যানুভূতি রমণীমূর্তিতে আভাসিতা। এই মূর্তি যেন সৌন্দর্যের আদিসত্তা—Eternal Beauty। এই সৌন্দর্যসত্তা চিরদিনই অপ্রাপনীয়া, তাই সৌন্দর্যভাবনায় বেদনার ভাব মিশে আছে। আর এই অপ্রাপনীয় বেদনার অনুভব থেকেই দুর হয় ভোগবিলাস, দূর হয় কামনাবাসনার সংরাগ। তাই সেই আদি সৌন্দর্যের নগ্নমূর্তির মহিমার কাছে মদনদেবেরও পরাজয় ঘটে। অখণ্ড সৌন্দর্যের এই বিজয়িনী সত্তাকেই কবি প্রকাশ করেছেন।

'এবার ফিরাও মোরে' চিত্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা—যেখানে কবি বাইরের কর্মচঞ্চল প্রবাহে নিজেকে মেলাতে চাইছেন। শুধু কাব্যময়, আত্মমগ্ন কল্পনা-লালিত রোম্যান্টিক মানসের অন্তরলোকেই নয়—তিনি ফিরতে চাইছেন বিচিত্র কর্মময় পৃথিবীতে, দৈনন্দিন আবর্তের মধ্যে। সংসারের ব্যথাবেদনা পীড়িত মানুষের মাঝে তিনি একাত্মতা অনুভব করতে চান।

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়"

এভাবেই চত্রিাকাব্যে কবির নিভৃত অন্তর্লোক ও কর্মময় বহির্লোক সমন্বিত হয়েছে। তাই এ কব্যের নাম কবিতা সার্থক তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী"

১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব

চিত্রার পরবর্তী কাব্য—চৈতালি। বঙ্গাব্দে ১৩০২ সনে প্রকাশিত এ কাব্যে মানুষের হৃদয়কে বড়ো কাছাকাছি দেখার কথা কবি লিখেছেন। আবেগ উচ্ছ্বলতার পরিবর্তে তাঁর দেখার মধ্যে এখন এসেছে প্রশান্তি। অন্তর ও বাইরের মধ্যে একটা সমন্বয় যেন এ কাব্যের সনেটগুলিতে ক্ল্যাসিক সংযমে স্থিতি লাভ করেছে। 'চৈতালি'র ব্যক্তিগত প্রেম কবিতার মধ্যেও এক সুগভীর প্রশান্তির আভাস। সেকারণেই রোম্যান্টিক কবিকল্পনা ক্ল্যাসিক রীতিতে সনেটে সংহত হয়ে দেখা দিয়েছে। একাব্যে মানবমহিমা, মর্ত্যধূলির প্রতি আকর্ষণ প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুরক্তি প্রকাশিত। সুগভীর শান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তর সমাহিত লাবণ্যে চৈতালির কবিতাগুলি উচ্ছ্বল।

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হল ক্ষুদ্রায়তন কবিতার সংকলন—'কণিকা'। এক ধরনের নীতিমূলক কাব্যকণা কণিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

'চৈতালি'র পর উল্লেখযোগ্য কাব্য ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ। অতীতচারণা ও সুদূরের আকঙ্ক্ষা জনিত বেদনার আভাস বিজড়িত এ কাব্য রবীন্দ্রনাথের অতীত ভারতে মানসভ্রমণের রূপচিত্র। রোম্যান্টিক স্বপ্নাচারণার মধ্য দিয়ে প্রেমভাবনার প্রকাশে এ কাব্যের রূপ নির্মিতিতে এসেছে অসামান্য সৌন্দর্য। অতীতচারণার সূত্রেই এ কাব্যে ফিরে এসেছে কালিদাসের কাল। স্বপ্ন কল্পনা আশা আর অনুভূতির সমন্বয়ে এ কাব্য সার্থক নামা। রোম্যান্টিক মনোভঙ্গি সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন—

"It is the rewakening of middle ages"—অর্থাৎ মধ্যযুগের পুনর্জাগরণ। তাই একাব্যে মধ্যযুগমুগ্ধতা ও কালিদাস প্রিয়তার প্রতিভাস। কালিদাস-প্রভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে স্বপ্ন মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভস্মের পরে ও বর্ষামঙ্গল কবিতায়। কুমারসম্ভব কাব্যের পঞ্চমসর্গে ধূর্জটির পদতলে পার্বতীর আত্মনিবেদনের অংশে কালিদাসের অসামান্য সৌন্দর্যলোক থেকে সূত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মদনভস্মের পূর্বে ও পরে' কবিতাদুটির রূপ নির্মাণ করেছেন।

আবার 'স্বপ্ন' কবিতায় উজ্জয়িনীর প্রসঙ্গ মহাকালের মন্দির, শিপ্রা নদী যেন কালিদাসের কালের মিথকে প্রত্নপ্রতিমায় চিত্রিত করেছেন। অতীত স্মৃতিবাহিত ঐতিহ্যকে কাব্যের ঐশ্বর্যে কল্পনার সৌন্দর্যে কবি বেঁধেছেন ছন্দবন্ধনে। 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'ভ্রষ্টলগ্নে'র মত কবিতাতেও পুরাণ প্রতিমাকে নতুন কল্পনায় উজ্জীবতি করেছেন।

কল্পনার সমকালে (১৯০০) প্রকাশিত 'ক্ষণিকা' বিস্ময়কর কাব্য। কল্পনা কাব্য থেকে পরবর্তী 'নৈবেদ্য' কাব্যের মধ্যে আছে এক ক্রমাভিব্যক্ত স্তর। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝখানে 'ক্ষণিকা' যেন ক্ষণকালের দ্যুতি। শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গাইবার আনন্দ এই কবিতাগুচ্ছে ধ্বনিত। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মতে

"ছোটখাটো সুখদুঃখ ও সহজ সরল প্রেমের কাহিনীর কাব্য এই ক্ষণিকা"—

অতীত চারণার মুগ্ধতা নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্ভাবনা নয়—বর্তমানের ক্ষণমুহূর্তের আনন্দ বেদনার সত্যরূপকে কবি মূর্ত করেছেন এ কাব্যে। ক্ষণকালের ছন্দে বাঁধা এই সহজ ভাবই ক্ষণিকার প্রাণ। বাস্তবজীবনে প্রেমের একটা সীমা আছে, সব কিছুর মধ্যেই তার স্থান—এই মানস পরিণতির কথা 'ক্ষণিকা'র প্রেমকবিতায় আভাসিত।

ক্ষণিকায় যেন ক্ষণকালের জন্য কবি নেমেছেন সহজ সাধনার লঘু পথে। হালকা ভাব ও ছন্দের সঙ্গে গভীর তত্ত্বের সমন্বয় দেখা দিল ক্ষণিকাতে। এর চটুল ছন্দের বাঁধনে জীবনের সুগভীর প্রত্যয় কৌতুক রসাস্নিগ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। স্মিত-কৌতুকের আড়ালে কখন যেন গভীর গোপন হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়েছে মধুর বেদনা-ধারা।

"আমারে পাছে সহজে বোঝো
তাই কি এত লীলার ছল
বাইরে থাকি হাসির ছটা
ভিতরে তার আঁখির জল"

রবীন্দ্রকাব্য ধারায় প্রেরণাদাত্রী যে কাব্যলক্ষ্মীর দেখা বারবার মেলে কখন যেন তিনি মিশে যান জীবনদেতা তত্ত্বের মধ্যে 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'অন্তরতম' কবিতাটিতে এই প্রেরণাকেই বাণীমূর্তি দান করেন কবি। জীবনের ক্ষণকালের আঙিনা থেকে আসা বাস্তব নায়িকা চিত্র ও এই ভাবকল্পনায় মিশে আছে। ক্ষণকালের আভাস থেকে কখন যেন চিরকালের তার সেই রূপকল্পনা কবি হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেছে। এই অনুভবই 'সমাপ্তি' নামে কাব্যের শেষ কবিতাটিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। জীবনের ক্ষণমুহূর্ত থেকে লীলাসঙ্গিনী যেন জীবনশেষের অচঞ্চল মুহূর্তেও কবির অন্তরের সাথী হয়ে রইলেন। যিনি প্রেরণা, তিনিই লীলাসঙ্গিনী, তিনিই অন্তরতমা আবার তিনিই

জীবনদেবতা। ক্ষণিকার ক্ষণকালের লীলার পরই কবি চিত্তে এক আধ্যাত্মিক ভাবনার, অলোকচারণার অস্ফুট পদসঞ্চার শোনা যায়, মধ্যবর্তী 'স্মরণ' ও 'শিশু'র পরই কবি বিরহপারের খেয়ায় ভেসে গিয়ে পৌঁছে যান 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য'র অধ্যাত্মচেতনার উপকূলে।

কল্পনা, ক্ষণিকার সমকালে রচিত হয়েছিল কথা ও কাহিনীর নাট্যকাব্য ও কবিতাবলী। কাহনীতে সংকলিত নাট্যকাব্যগুলি নাটক পর্যায়ে আলোচিত। 'কথা' গ্রন্থের উপাদানও প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আহরিত কথা ও কাহিনী গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথকৃত মন্তব্যটি উদ্ধার করলে এর আন্তরধর্মের পরিচয় পাওয়া যাবে।

"এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে,
যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তার"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নৈবেদ্য প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি ঔৎসুক্য ও আনুগত্যের পরিচয়বাহী। এর প্রথম পর্বের কয়েকটি কবিতায় ব্যক্তি হৃদয়ের অনুভূতি বাণী পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু এর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি ভিন্ন স্বাদবাহী। উনিশ শতকের রক্তসন্ধ্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর উন্মত্ততা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের অত্যাচারিত মানবাত্মার বেদনায় বিদীর্ণ চিত্ত কবি এই সাম্রাজ্যবাদের চরম বিরোধিতা করেছেন।

"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অবস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসাধনা একসময় মিলে গেছে তাঁর অধ্যাত্মভাবনায়। এর চরণতম প্রকাশ ঘটেছে নৈবেদ্যর সনেটগুলিতে। প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শকে কবি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন ভোগবাদী মানবসমাজে। একদা এ ভারতের কোন বনতলে যে উদাত্ত অমৃতবাণী উচ্চারিত হয়েছিল তাকেই তিনি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মৃত আত্মায় সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত ব্যবহার করেছেন—

"রে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ"।

আত্মশক্তিতে জাগ্রত হতে, উপনিষদের ভাবনায় প্রাণিত হতে প্রার্তনা জানিয়েছেন কবি—

"তবে কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর"

কবি পত্নী মৃণালিনীদেবীর অকাল প্রয়াণের স্মৃতিতে রচিত কাব্য 'স্মরণ' (১৯০৩)। এখানে যে শোক—তা তত্ত্বগত বা ভাবগত নয়—একান্ত ব্যক্তিগত। কবির ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের শূন্যতার উপলব্ধি 'স্মরণ' কাব্যে ধরা পড়েছে। মৃত্যু রবীন্দ্র প্রেমচেতনায় এক বিষ্টি স্থান অধিকার করে আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে মৃত্যু জীবনের রসকে নিবিড়তর করে এবং যথার্থ প্রেম ও অনুভূতির প্রকাশে মৃত্যু আমাদের চিত্তে অমৃতের স্পর্শ এনে দেয়। তাই তিনি বলেন—"তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী"।

১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৩) 'শিশু' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর শিশুপুত্র ও কন্যাকে ঘিরে কবির যে জীবন তারই বাৎসল্য ধারা নিঃসৃত কাব্য রস উৎসারিত 'শিশু'-র কবিতাবলীতে। কিন্তু কেবল স্নেহ বাৎসল্যরসই 'শিশু' কাব্যের একমাত্র রস নয়, সমালোচক বলেছেন—"শিশুর কবিতা শিশুর মুখের কথা নয়,

শিশুমনের কথাও নয়, শিশুকে আশ্রয় করিয়া বাৎসল্যরস যাহার মধ্যে মূর্তি লইয়াছে, তাহার মুখের কথা, মনের কথা।”

‘উৎসর্গ যদিও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল—এর অধিকাংশ কবিতাই ১৯০১ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে রচিত। মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন তাতে কবিতাগুলি ভাবানুযায়ী এক একটি গুচ্ছে বিন্যস্ত ছিল। প্রতিটি গুচ্ছের ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ একটি করে কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। মুখবন্ধ স্বরূপ সেই কবিতাগুলিই একত্রে ‘উৎসর্গ’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

‘খেয়া’ কাব্য রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় এক বিশিষ্ট অধ্যায়। বহির্জীবনের সংঘাত ও অন্তর্জীবনের বেদনার অভিঘাতে ‘খেয়ার’ রচনাকাল কবি জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমাহিত চিত্তে ভাবগভীর প্রশান্তিতে অন্তর ও বাইরের আলোড়নকে আত্মস্থ করে কাব্য রচনা করে চলেছেন।

এই সময় বঙ্গদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে এক প্রবল আবেগও আন্দালন ক্রিয়াশীল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে সারা দেশ চঞ্চল। প্রবল ভাববন্যায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও সেই প্রাণবন্যায় যোগ দিলেন উদাত্ত গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়। বহির্জগতের কর্মপ্রবাহে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করলেন। ‘খেয়া’ সেই সময়ের সাহিত্যফল।

কিন্তু এই দেশব্যাপী উত্তেজনার কালে কবির ব্যক্তিজীবনেও নেমে এসেছিল মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাত। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে কবি হারালেন তাঁর পিতা, স্ত্রী এবং দুই পুত্র-কন্যাকে। বাইরের কর্মপ্রবাহে সক্রিয় কবির অন্তর জীবনের এই বিরহবেদনা ‘খেয়া’ কাব্যে এক অন্যতর মাত্রা এনেছে।

এক অধ্যাত্মগভীর ভাবে ‘খেয়ার’ কবিতাগুলি বিশিষ্ট ভাবদ্যোতক হয়ে উঠেছে। কর্মজীবনের চাঞ্চল্য ও ব্যক্তিজীবনের একাদিত্বের মাঝে কবি যেন আলো আঁধারি প্রদোষ বেলায় উপনীত। বিরহপারের খেয়ায় ভেসে তিনি যেতে চান জীবন নদীর ওপারে। তাই তাঁর অকুল অপেক্ষার অনন্ত আহ্বান—

‘ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়”

‘খেয়া’ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রজীবনের যে অলোকচারণা পর্ব শুরু—তারই আভাস যেন এ কাব্যে শোনা গেল। ‘আগমন’ কবিতার মধ্যে ঝড়ের রাতে যে দুঃখরাতের রাজার দেখা পাই—তিনিই রবীন্দ্রজীবনের অসীম অরূপরতন রাজাধিরাজ, প্রভু।

“ওরে দুয়ার খুলে দেরে
বাজা শঙ্খ বাজা
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা”

খেয়াতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক নবতর রূপের প্রকাশ ঘটলো। ভাষার সলতার সঙ্গে যুক্ত হল রহস্যময়তা ও অতীন্দ্রিয় সাংকেতিক ব্যঞ্জনা। ‘খেয়া’ কাব্য থেকেই রবীন্দ্রমানসে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নবতর রূপের আভাস দেখা গিয়েছিল, তা পরিণতির পূর্ণতায় পৌঁছলো ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বে। এসময়কার গীতাখ্য তিনটি কাব্য গ্রন্থ (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি) রবীন্দ্রনাথের অলোকচারণার পরিচয় বহন করে। এই তিনখানি কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই গান—এদের নামকরণেই সেই গীতিময়তা পরিস্ফুট।

১.৩.৫ পঞ্চম পর্ব

গীতাঞ্জলি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—যদিও এর কবিতাগুলি তার আগেই কিছু কিছু রচিত হয়েছিল, অধ্যাত্মসাধনার বেদনা, তার বিভিন্ন স্তর ও বিরহের অস্ফুট ক্রন্দন গীতাঞ্জলিতে ধ্বনিত। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতে গীতাঞ্জলিতে ঈশ্বর বিষয়ক কোনো তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন কবির অনুভবকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে রোম্যান্টিক প্রেমের এবং প্রকৃতি অনুরাগের গান আছে, যাতে লেগেছে ভক্তির ছোঁয়া—‘যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা’।

খেয়া এবং গীতাঞ্জলি পর্বের তিনটি কাব্যের অধিকাংশ কবিতার লগ্ন হয় গোধুলি, নয় আঁধার রাত্রি, নির্জন নদীতীর। কখনো ঝড়ের রাতে আসেন দুঃখ রাতের রজা, কখনো রাত্রি এসে দিনের পারাবারে মিশে যায় আবার কখনো করি অনুভব বেদনার গান হয়ে ওঠে—

“আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে”। গীতাঞ্জলিতে সাধনার এই মধুর বেদন ও বিরহের ব্যাকুল রোদন ধ্বনিত।

ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ (Song offering) উপলক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পান। ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে নৈবেদ্য ও খেয়ার অনেক কবিতা, গীতিমাল্যর কিছু গান ও গীতাঞ্জলির অনেক গান অনূদিত হয়ে স্থান পেয়েছে।

“গীতাঞ্জলি’র অধ্যাত্ম অনুভূতি পূর্ণতার রূপে প্রকাশিত হয়েছে গীতিমাল্য ও গীতালিতে। গীতাঞ্জলির বিরহ বেদনার দহনজ্বালার শেষে গীতিমাল্য ও গীতালিতে জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ আলাপন।

“কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে”

১.৩.৬ ষষ্ঠ পর্ব

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘বলাকা’ কাব্যে এক নতুন সুর ধ্বনিত হল। রবীন্দ্রমানসে সঞ্চারিত উপনিষদের ‘চরৈবেতি’ মন্ত্র এবং ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গতিতত্ত্ব মিলে এক সমন্বিত তত্ত্বের দেখা পাওয়া গেল। মানুষের অবিরাম গতিশীলতা ও জগতের প্রতিটি মুহূর্তের নবরূপে সৃষ্টি হওয়াকে বের্গসঁ তাঁর রচনায় তুলে ধরলেন।

“We change without ceasing and the state itself is nothing but change”

রবীন্দ্রমনোধর্মে এ সময় পরিবর্তনবাদের তত্ত্বটি নূতনরূপে উপলব্ধি হয়। তবে রবীন্দ্রচেতনা পুরোপুরি বের্গসঁর প্রভাব সঞ্জাত ছিল না। ছিল না বলেই পরিবর্তনবাদ ও গতিশীলতার মধ্যেও প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণার শাশ্বত আবেদনকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। ‘বলাকা’-র ছবি কবিতায় জীবনচাঞ্চল্যের সঙ্গে প্রেমের অচঞ্চল স্মৃতি মহিমা আলোচিত।

জীবনচাঞ্চল্যের বৈশিষ্ট্য রূপেই ‘বলাকা’ কাব্যে এসেছে যৌবনবন্দনা। ‘সবুজের অভিযান’ কবিতায় সেই নবীন প্রাণবন্যার প্রবাহকেই উপলব্ধি করা যায়। কবিতার এই যৌবনদীপ্ত চাঞ্চল্যকে যথাযথ প্রকাশ করবার জন্যই বলাকায় কবি নতুন ছন্দের প্রয়োগ ঘটালেন। এর মুক্তক ছন্দ কবিতার অন্তরধর্মের চাঞ্চল্যকে সার্থক প্রকাশ করলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার মধ্যেকার দহনযজ্ঞর বীভৎস রূপ, বিশ্বসৃষ্টি ও গতিবাদের দার্শনিকতা, যৌবনের জয়গান, কবির ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি-ঈশ্বর উপলব্ধি নানা বিষয়ের কবিতা নিয়ে ‘বলাকা’ কাব্য গ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্যধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজন।

পরবর্তী কাব্য ‘পলাতকা’ ১৯১৮-তে প্রকাশিত। গল্পরসের মিশ্রণ দিয়ে গড়া এ কাব্যের কবিতাগুচ্ছ। ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম অনুভূতির পরমতম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু ‘পলাতকা’-য় আবার তাঁর দৃষ্টি পড়লো মর্ত্য ধুলির দৈনন্দিন জীবনরঙ্গে। তাই মানবজীবনের সুখ-দুঃখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে কবি গেঁথে তুলেছেন হাসি কান্নার হীরাপান্নার মালায়। তাই অতি তুচ্ছ রেল স্টেশনের কুলী বউয়ের বেদনা কিংবা মুক্তি ও নিষ্কৃতির দুই সাধারণ মেয়ের মধ্য দিয়ে চিরচেনা ঘরোয়া জীবনছবি অনুভবগভীরতায় সুমুদ্রিত হয়ে যায়। নারীর মূল্য সম্বন্ধে সমাজদৃষ্টির সমালোচনা এ কাব্যের অনেক কবিতাতে রূপ নিয়েছে।

‘শিশুভোলানাথ’ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আমেরিকা ভ্রমণের পর মানসিক শান্তি পেতেই যেন শিশুর স্বপ্নরাজ্যে ফিরতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ।

> “আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম।
> ......শিশুলীলার মধ্যে ডুবদিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে
> স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে মুক্ত করবার জন্য”

‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে যেন রবীন্দ্র কাব্যধারায় লেগেছে শেষবেলাকার সুর। এর নামকরণেই প্রদোষ বেলার রাগিনীর ছোঁয়া। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সরকারের আমন্ত্রণে কবি তাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করে চারমাস পরে দেশে ফেরেন। পূরবীর অধিকাংশ কবিতাই সেসময়ের রচনা আগের লেখা কবিতাগুচ্ছ ‘পূরবী’ নামে ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রবাসকালের কবিতাগুচ্ছ ‘পথিক’ নামে সংকলিত।

এই কাব্যগ্রন্থটি ‘বিজয়ার করকমলে’ উৎসর্গীকৃত। আর্জেন্টিনা বসবাসকালে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামে যে বিদূষী মহিলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল তাঁকেই কবি ‘বিজয়া’ নামকরণে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

একাব্যের কবিতায় এক ব্যথাম্লান করুণতার আভাস। জীবনের শেষ বেলাকার স্মৃতিচিহ্নিত বেদনার ভাবে কবিতাগুলি অপরূপ স্নিগ্ধকরুণ।

> “দেখ নাকি হায় বেলা চলে যায় সারা হয়ে এলো দিন
> বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ”

জীবনের সাঁঝবেলাতে কবি চিত্তে দোলা দিয়ে যায় ফেলে আসা যৌবনবাসনার স্মৃতিলগ্ন দিন। অতীতের সৌন্দর্যরসভরা দিনগুলোকে একমাত্র স্মৃতির মধ্য দিয়েই ফিরে পাওয়া যায়। তাই ‘খেলা’, ‘কৃতজ্ঞ’, ‘কিশোর প্রেম’, ‘শেষ বসন্ত’ প্রভৃতি কবিতায় লেগে আছে সেই বেদনমধুরিমা।

এই বেদনার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে ‘লীলাসঙ্গিনী’ কবিতায়। ‘পূরবী’ কাব্যকে কবির ‘ দ্বিতীয় যৌবনের’ কাব্য বলা যায়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কবির হাতের লেখা কবিতা ‘কণিকা’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘লেখন’ নামে। যখন চীন-জাপানে গিয়েছিলেন কবি, তখন প্রায় প্রতিদিন স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে গিয়ে রচিত হয়েছিল এই ‘কবিতিকা’।

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘মহুয়া’ রবীন্দ্র কাব্যধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজন। কবি চিত্তে যে নববসন্তের আবির্ভাব দেখা গিয়ছিল ‘পূরবী’ রচনাকালে, ‘মহুয়া’ যেন সেই বসন্তের অনুচর হয়ে নবপ্রেম উন্মাদনার রস সঞ্চারে যুক্ত হল। বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের চরমতম প্রকাশ মহুয়া। প্রেমের মধ্যে যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল, সাধারণ মানুষকে অসামান্য করে দেখার মায়াঞ্জন আছে সেই মায়ালোক কেই ‘মহুয়া কাব্যে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রেমের বহিরঙ্গ প্রসাধনকলা ও অন্তরঙ্গ সাধনার সমন্বিত প্রকাশে ‘মহুয়া’র কবিতাগুলি অপরূপ। ‘মহুয়া’ কাব্যে সংকলিত কয়েকটি কবিতা লেখা হয়েছিল ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের জন্য। ভাবের সাযুজ্য থাকায় সেগুলি ‘মহুয়া’তে স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগুলিতে একটি তত্ত্বের ছোঁয়া আছে। যে প্রেম বন্ধ করে না, মুক্তির মাঝেই খুঁজে পায় সার্থকতা, গতিময় প্রেমের সেই সক্রিয়তাই ‘শেষের কবিতায়’ ব্যক্ত। এর কবিতাতেই তাই জীবনবেগের স্পন্দনের সঙ্গে জীবনাবেগের সার্থক যোগ ঘটেছে।

'মহুয়া'র পর প্রকাশিত হয় 'বনবাণী' (১৯৩১) বৃক্ষলতায় এক প্রাণের লীলার সৌন্দর্য এ কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত। কবি বলেছেন—

"ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের ডালে
ডালে পাতায় পাতায় এক ছন্দের নাচন।"

রবীন্দ্রমানসে নিসর্গচেতনার যে বোধ আবাল্যযুক্ত—তাই নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় বন্দিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় তাঁর ঘরের আশেপাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে—তাদের ডাক তাঁর মনের মধ্যে পৌঁছে এক মিতালির বন্ধনে জড়িয়েছে। বনবাণী বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে কবি চিত্তের সেই মিতালীর গান। পরিশেষ কাব্য ১৯৩২ সালে প্রকাশিত। এর নামকরণেই কবি এক সমাপ্তির আভাস দিতে চেয়েছেন। এ কাব্যের কিছু কবিতা কলকাতার উপকণ্ঠে রচিত। অবশিষ্টগুলি জাভা-বালীদ্বীপে ভ্রমণকালে লিখিত।

সমালোচক এ কাব্যকে বলেছেন কবির আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপরিচয়ের কাব্য। সত্তর বছরের প্রান্তে এসে কবি যেন তাঁর সারাজীবনের ক্রমাভিব্যক্ত স্তরকে নিজেরই দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে উপলব্ধি করছেন—

"দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে, একের চরণে রাখিলাম বিচিত্রের
নর্মবাঁশি—এই মোর রহিল প্রণাম"

১.৩.৭ সপ্তম পর্ব

কিন্তু দিনান্তের পরেও আবার নতুন প্রভাত আসে। রবীন্দ্রকাব্য তাই পরিশেষ হয়েও সমাপ্ত হয় না—তাই ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয়—'পুনশ্চ'। রবীন্দ্র কাব্যধারায় যে ভাবপ্রবাহ 'পরিশেষ' পর্যন্ত বহমান সেই ধারায় নতুন সংযোজন 'পুনশ্চ'। এই নতুনত্ব ধরা পড়েছে বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে। তাই পুনশ্চ রবীন্দ্রকাব্যে পালাবদলের কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ সর্ব অর্থেই আধুনিক মানুষ, সময়ের প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুগলক্ষণকে স্বীকার করে সাহিত্যে সমকালীন বাস্তবকে মেনে নেন। রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পপ্নময়তা সত্ত্বেও জীবনকে দেখার গভীর সত্য দৃষ্টি তাঁর ছিল। তাই মনন কল্পনার নবীকরণ তাঁর পক্ষেই করা সম্ভভব। মননের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে রীতি পরিবর্তনও ঘটেছে এই কাব্যে।

'লিপিকার'ও আগে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে মুক্তক ছন্দের সৃষ্টি হয়েছিল। 'লিপিকা'য় গদ্য কবিতা লেখার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। তার সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্তি ঘটলো 'পুনশ্চ'তে এসে, দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বকে রূপ দেবার মাধ্যম হিসাবে এখানে এলো গদ্যছন্দ পূর্ণরূপে।

ভাষা পরিবর্তন ছাড়া কবিতার রস বিচারেও পরিবর্তন এসেছে। এর গদ্যভাষা সহজ, আটপৌরে, ছন্দোরীতি বাঁধনভাঙা আর মনোভঙ্গীতে ধরা পড়েছে আধুনিককালের ভঙ্গুরতার ছবি। বিড়ম্বিত তুচ্ছ মানুষের প্রতি সহমর্মিতার কবিতা যেমন আছে (ছেলেটা, সহযাত্রী, বালক, সাধারণ মেয়ে) আছে কীটের সংসার-এর মতো তুচ্ছ বিষয়ও। সেই সঙ্গে অস্পৃশ্যতা আন্দোলন বিষয়ক কয়েকটি কবিতার রূপায়ণে সমসাময়িককালে গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের প্রভাব মুদ্রিত। অবশ্যই রবীন্দ্রচেতনার অন্তর্লোকে এই মানবতাবাদী চেতনা পূর্বেই ছিল। 'পুনশ্চ'তে যে প্রেমের কবিতার দেখা মেলে তা রবীন্দ্রসাহিত্যে অভিনব। প্রেমের উর্ধায়ন বা Sublimation কিংবা বিরহতত্ত্ব নয়—পরিবর্তে বস্তবের নির্মম সত্যকে যথাযথ উপস্থিত করা হয়েছে। মানুষী প্রেমের দুর্বলতার বাস্তব ছবি বর্ণরিক্ততায় চিত্রিত এ কাব্যে।

আবার বিদেশী প্রভাবজাত কিছু কবিতাও এ কাব্যে স্থান পেয়েছে। ১৯৩০ সালে জার্মানিতে অবস্থানকালে The Child নামে কবিতার অনুবাদ করেন 'শিশুতীর্থ'। এছাড়া টি. এস. এলিয়টের "Journey of the Magi" কবিতার অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী', 'পুনশ্চ' কাব্যতেই স্থান পেয়েছে।

পরবর্তী দুটি কাব্য 'শেষসপ্তক' ও 'বীথিকা' ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষসপ্তকে বিচিত্রধর্মী কবিতার দেখা পাই—অতীত স্মৃতি মৃত্যুরহস্য, জীবন সম্পর্কে তত্ত্বভাবনা ও অসামান্য কিছু, প্রেকবিতা। 'পুনশ্চ'র ভেঙে যাওয়া প্রেমের নির্মমতা এখানে নেই, কিন্তু বাস্তব জীবনের শূন্যতাবোধে রিক্ত অথচ স্মৃতিমাধুর্যে পরিপূর্ণ অসামান্য প্রেমানুভব আছে। তারই অনবদ্য স্বীকারোক্তি মেলে এর ৪৫নং কবিতায়—

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে
পূবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছু ডাক
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে....
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা
....
তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে
—শেষ কথা বলে যাব
'দুঃখ পেয়েছি অনেক
কিন্তু ভালো লেগেছে
ভালো বেসেছি।'

'বীথিকা' কাব্যেও বিস্মৃত-চিরস্মৃত প্রেমের দুইরূপ ধরা পড়েছে। 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় কৌতুকস্নিগ্ধ সংলাপে আমন্ত্রণী পত্রটি কবির ব্যক্তিগত গৃহস্মৃতির মাধুর্যে মনকে ভরিয়ে দেয়।

আবার 'পোড়ো বাড়ি' কবিতাতে স্মৃতির সুখাবেশ নয়—দেখি অন্যতর রূপের আভাস।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পত্রপুট' গদ্যছন্দে রচিত। কবির আত্মভাবমূলক নানা কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলি যেন গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধের সংহত কাব্যরূপ। 'পৃথিবী', 'ওরা অন্ত্যজ' প্রভৃতি এ কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা।

কবির শেষবেলাকার বাসার নাম 'শ্যামলী'। "এই যে কালো মাটির বাসা, শ্যামল সুখে ভরা"—সেই বেলাশেষের মাটির ঘরের নামেই তাঁর বেলাশেষের এক কাব্য 'শ্যামলী' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে।

গদ্যছন্দে রচিত এ কাব্যের কয়েকটি কবিতা কথিকাধর্মী। এগুলিতে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশের ছবি দেখা যায়। 'হঠাৎ দেখা', 'কণি', 'অমৃত'—তিনটি অসামান্য প্রেমকবিতা যার মধ্যে প্রেমের সহজ আলো বিকীর্ণ অথচ কোনো তত্ত্ব বা দার্শকিতার প্রলেপ নেই।

উদ্ভট কল্পনা ও কৌতুকরসের মিশ্রণে রচিত ছোট কবিতার সংকলন 'খাপছাড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। কবির স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্রে শোভিত এই গ্রন্থটি ভিন্ন স্বাদ বহন করে।

একই বছরে প্রকাশ পায় 'ছড়ার ছবি'—নন্দলাল বসুর কিছু স্কেচ অবলম্বনে এর কবিতাগুলি রচিত। অনেক কবিতাই গল্পধর্মী।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ কবিজীবনের শেষ পর্যায়। এই গোধূলিবেলার কাব্যে ধরা আছে তাঁর শেষবেলাকার ভাবনা, চেতনা, বোধ, প্রত্যয় ও অনুভব।

প্রথম কাব্য—প্রান্তিক। অসুস্থতাজনিত আকস্মিক চৈতন্যলুপ্তি ও আরোগ্যলাভের পর এর কবিতাগুচ্ছ রচিত। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'অন্ধকারের ভীষণ শক্তির সঙ্গে' প্রাণ শক্তির সংগ্রাম—অধিকাংশ কবিতার বিষয়। চেতন-অচেতনের প্রান্তে এসে যে কবিতার জন্ম তার নাম সঙ্গত কারণেই কবি দিয়েছেন 'প্রান্তিক'।

আত্মার চরম মুক্তি আস্বাদনের জন্য কবি যেন মহা অনন্তের মধ্যে লীন হতে চান। এই গভীর আত্মমগ্ন প্রশান্তির কালে যখন বিশ্বজুড়ে রণদামামার হুঙ্কার তখন মানুষের অপমানে ক্ষুব্ধ করি লিখনের প্রান্তিকের শেষ দুটি কবিতা—অন্যতর ভাবনাবাহী।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'—ঈর্ষাকতর, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব কবলিত পৃথিবীর বিকৃতরূপে বিক্ষুব্ধ কবি চিত্তের যন্ত্রণা এখানে মূর্ত।

১.৩.৮ অষ্টম পর্ব

সেঁজুতি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি নিজের জীবনসন্ধ্যায় যেন নিজ হাতে জ্বেলেছেন সাঁজের বাতি। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে যেন জীবনের দিবাবসানের হিসেব মেলাতে চায় কবিরহৃদয়। যাবার মুখে, পরিচয়, জন্মদিন—সব কবিতাতেই বিদায়বেলার সুর লেগেছে। এই আত্মভাবনামূলক জীবনশেষের বোধে উজ্জ্বল সেঁজুতির কবিতাগুচ্ছ—যেখান পড়েছে অস্তগামী রবির বিদায় বেলার বিষণ্ণ ছায়া।

'প্রহাসিনী' ভিন্ন স্বাদের কাব্যগ্রন্থ। "সেজুঁতি'র পরেই প্রকাশিত (১৯৩৯) এই কবিতাগুচ্ছ হাস্যরসাত্মক। কবির জবানিতে বলা হয়েছে—"আমার জীবনকক্ষে জানি না কি হেতু/মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু"

কবির শেষ বেলার গান—আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি বলেছেন—এর কবিতাগুলি "স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা"। শেষ বয়সে মানুষ স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চায়। ঘরের মাঝে যখন চেনামুখের মেলা সাঙ্গ হয়ে আসে, ঘনিয়ে আসে সাঁঝের বেলা—তখন স্মৃতিই মানুষের আশ্রয়। এই অতীত স্মৃতি স্বপ্নের আলোছায়ার মায়া ঘেরা 'আকাশপ্রদীপ' কাব্য। এ আকাশ কবির মনের আকাশ যেখানে সাঁঝবেলায় স্মৃতির নক্ষত্র খচিত।

স্মৃতিসুরভিত অসামান্য কয়েকটি কবিতায় গভীর অনুভবের বাণী উচ্চারিত। 'শ্যামা', 'কাঁচাআম', 'বধূ', 'সময়হারা' প্রতি কবিতাই স্মৃতি মাধুরী ঘেরা। অতীতের স্মৃতিস্বর্ণিমা আজ ধূসর জীবনের গোধূলিতে ফেলেছে ছায়ামাধুরী। এই বেদনা বিধূর অনুভবেই শেষ হয়েছে 'আকাশপ্রদীপ', তবে কবির স্থির প্রত্যয় মিলনদিনে সাক্ষী ছিল যারা—"আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা"। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে নতুন ধরনের কাব্য 'নবজাতকের' সূচনায় কবি বলেছেন—

"আমার কাব্যে ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে।.... এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা
হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মনভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য"

কবি জীবনের প্রৌঢ় ঋতুর এই নবজাত কবিতায় ধরা পড়েছে নতুন সমাজ চেতনা, ইতাহস চেতনা। দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব এ কাব্যের নামকরণের সার্থকতাকে প্রমাণ করে। কবি নিজের মনন কল্পনাকে বিস্তৃত করে বর্তমানযুগের নতুন বিষয়কে কাব্যের উপাদান করেছেন—এরোপ্লেন, রেডিও, রেলগাড়ি।

পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বর্তমান সভ্যতার আত্মক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক রূপের নিষ্ঠুর ছবি। এই সভ্যতার ধ্বংসকামনা করে কবি নতুন জীবনের আশায় জাগ্রত থাকতে চান। বর্তমানের ধ্বংসকামনা ও নবসৃষ্টিতে বিশ্বাসই 'নবজাতকে'র কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে।

একই বছরে প্রকাশিত হয়—'সানাই' কাব্যগ্রন্থ। গীতিকাব্য হিসেবে 'সানাই' সম্ভবত এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই কাব্যে ভালোবাসার রাগিনী যেন ধরা পড়েছে সানাই-এর সুরে। এর নামের মধ্যে যে মিলন দিনের প্রতীকদ্যোতনা তার মধ্যেই ধরা আছে এর ভাবকল্পনা। 'সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত'—কবির এই উচ্চারণের অনিবার্য স্বাক্ষর 'সানাই'।

এ কাব্যের অনেকগুলি কবিতা পরে সঙ্গীত রূপান্তরিত হয়েছে—অনেক গান থেকে আবার ছোটো কবিতা রচিত হয়েছে। বিশেষভাবে রোম্যান্টিক মন ও প্রেমানুভব এ কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত।

দীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় স্মৃতিবেদনার যে মালা গাঁধা হয় মনের নিভৃতে, তারই সৌরভ যেন কবির মনে রচনা করে এক মানসী মায়া, যুগান্তরের প্রিয়াকে লোকান্তরের নির্বাসন থেকে হৃদয়ে অনুভব করেন তিনি।

"আজ এ মনের কোন সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া
দূরে উড়ে যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া"

এভাবেই সানাই কাব্যের গানের সুর লেখা কবিতাতে তাঁর বাসনা ও বেদনাকে অনুভব করতে পারি। প্রণয়স্মৃতির সঙ্গে এতখানি বেদনা এমনভাবে কবিকে আগে ঘিরে ধরেনি। সানাই সেই প্রেমবেদনার মধুরতম উচ্চারণ।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত হল 'রোগশয্যায়'। নামকরণের মধ্যেই এর সুরটি ধরা পড়েছে। কালিম্পঙে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কবি ফিরে আসেন কলকাতায়। রোগ যন্ত্রণার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে আরোগ্য লাভের প্রাণশক্তির অনুভব। এজন্যই এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম 'আরোগ্য'। মাত্র দুমাসের ব্যবধানে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৪০-এর শেষে 'রোগশয্যায়' ও রোগমুক্তির পর ১৯৪১-এর প্রথমে 'আরোগ্য।'

'রোগশয্যায়' জীবন-মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির এক তত্ত্ব বা দর্শন যেন কবিচিত্তকে অধিকার করেছে। ফলে রোগজর্জর যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি নয়, নির্ভীক সহিষ্ণু মননশক্তির প্রকাশে কবিতাগুলি উদ্দীপ্ত। দেহ যন্ত্রণা যত তীব্র, যত সত্যই হোক—তা প্রাণেরই সঙ্গী। তাই কবির রচনায় মানুষের দুঃখবিজয়ী প্রাণসত্তার জয়গানই ধ্বনিত।

"অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান"

একই সঙ্গে ব্যক্তিগত দুঃখ ও রোগের প্রসঙ্গ কবিকে বৃহত্তর জনগণের বিচিত্র দুঃখবেদনার সহমর্মী করে তুলেছে। সর্বজনের দুঃখ যন্ত্রণা যেন নিজের রোগ যন্ত্রণার উর্ধে উঠে তাঁকে করে তুলেছে সর্বমানবের ব্যথাবেদনার অংশীদার। 'আরোগ্য'-র কবিতাগুলিতে 'রোগশয্যার' কবিতার সুর ধ্বনিত। তবে এখানে আরোগ্যোত্তর চিত্তে ধরা পড়েছে সত্যের অমৃতরূপ। তাই তাঁর আত্মসমাহিত প্রশান্ত চিত্তের নিবেদন—

"শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরনীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি"

মর্তধূলির তিলক মানুষের ভালোবাসার প্রতীক। তাই যাবার আগে ধূলার ধরণীর প্রীতস্নিগ্ধ দান সর্ব অঙ্গে ধারণ করতে চান কবি। মৃত্যুর পটভূমিকার অস্তিত্বের সত্যকে উপলব্ধি করে কবি জীবন ও সৃষ্টির অনিঃশেষ প্রবাহে মিলতে চান।

'জন্মদিনে' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (ইং-১৯৪১)। জন্মমৃত্যুর সন্ধিলগ্নে উপনীত হ'য়ে কবি রচনা করেন যে কাব্য তার নাম দিলেন 'জন্মদিনে'। আসন্ন মৃত্যুর পদসঞ্চারে তাঁর জীবন ভাবনা শান্ত-সমাহিত, প্রশান্ত।

"যে রহস্যসূত্রে এসেছিনু আশি বর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে'

মৃত্যুর করাল ছায়া নয় যেন তার অমৃত স্পর্শই কবি জীবনে অনুভব করতে চাইছেন। তাই জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের মুখোমুখি বসে তিনি সত্য সুন্দরের অমৃতময় মূর্তিকে উপলব্ধি করতে চান।

যাবার বেলায় নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতার বেদনাকেও কবি অনবদ্য রসরূপে প্রকাশ করেছেন। তাই বলেন—

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"

তাই আগামী দিনের কোনো কবির জন্য তিনি কান পেতে আছেন—তাকেই জানান আহ্বান—

"এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের"

উদার কবিচিত্ত তাই আপন অসম্পূর্ণতার বেদনাকে লিপিবদ্ধ করেন 'জন্‌দিনে'র অসামান্য এই কবিতায়।

"আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী"

কিন্তু কবি জানেন সর্বমানবের সুখদুঃখের রূপকার হতে গেলে অন্তরের পরিচয়েই তাদের কাছে যেতে হ'বে।

"সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়"

কবিমানসের এই অন্তরতম প্রীতিময় জীবনবোধই তাঁর যাবার বেলাকে স্নিগ্ধসুষমায় ভরে দিয়েছে। 'জন্মদিনে' সেই আন্তরিক উচ্চারণ ধ্বনিত।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ—'শেষলেখা', তাঁর মৃত্যুর পরে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে—ইং ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর নামকরণ কবিকৃত নয়—সর্বশেষ রচনা বলেই এটি 'শেষলেখা' নামে আত্মপ্রকাশ করে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথঠাকুর জানিয়েছিলেন যে শেষ শয্যায় কবি এর অনেক কবিতাই মুখে মুখে বলেছিলেন—অন্য কেউ তা লিপিবদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই কাব্যের কবিতাগুলিতে মৃত্যু চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। মৃত্যু চেতনার ক্রমাভিব্যক্ত স্তর এক পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে শেষপর্যায়ের কাব্যে।' 'প্রান্তিক' থেকে 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' হ'য়ে জীবনমৃত্যুর স্বরূপ সম্ভবন্ধে কবির অনুভূতি চরমপর্বে 'শেষলেখা'য় এসে প্রকাশিত হ'য়েছে সংক্ষিপ্ত, নিরাভরণ সরল সংহত উচ্চারণে। মন্ত্রের মতো হ্রস্ব, কঠিন, তেজোগর্ভ এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিরূপে নন ভাস্বর হ'য়ে উঠেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি রূপে। এখানে তিনি দুঃসহ তেজে মৃত্যুকে পরাভূত করে আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভ করেছেন। মৃত্যুর বিভীষিকা নয়, তার প্রশান্তরূপের উপলব্ধিই কবির চেতনাকে ঋদ্ধ করেছে। তাই তিনি বলেছেন—মৃত্যুর ছলনা ও মিথ্যা আশ্বাসের প্রতারণা যে বুঝতে পারে—সে-ই শান্তির অক্ষয় অধিকার লাভ করতে পারে। কবি এ-ও বুঝেছেন যে এ জগৎ স্বপ্ন নয় মায়া নয়। জীবনের অমৃতকে গ্রাস করার ক্ষমতা নেই মৃত্যুরূপী রাহুর। এই সত্যকে অন্তরে ধ্রুব বলে জেনেছেন বলেই এখনও পাখির গান তাঁর অন্তরে সুধাবর্ষণ করে, সত্যের অন্তিম প্রীতিরস জীবনের চরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। মৃত্যু যে সত্য নয়, ধ্রুবতারকার চিরজ্যোতিই অনির্বাণ এই সত্য উপলব্ধি করেই কবি বলেন—

"মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি"

তিনি জেনেছেন প্রকৃত দুঃখে নয়—'দুঃখের পরিহাসে ভরা' এ জীবন। তখনই দেখেছেন ভয়ের বিচিত্র ছবির মধ্যে "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে"। তাই শান্তি পারাবারের উদ্দেশে তাঁর আসন্নযাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত।

'শেষলেখা' পর্বে যখন জীবনসীমায় অন্তরবির বর্ণমাধুরী দিব্য বিভায় বিচ্ছুরিত, যখন আঁধার নামছে জীবনবেলায় তখনও মৃত্যুর মধ্যে তার পূর্ণ প্রশান্তি—মৃত্যুর প্রসন্ন করপুটে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে কবি সার্থক সম্পূর্ণ হ'তে চান।

কৈাশোরের দিন থেকে অন্তিম প্রহর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কবিজীবনের যাত্রা পথে রচিত হয়েছে অনন্য কাব্য সম্ভার।

কবি কাহিনী, বনফুল থেকে যাত্রারম্ভভ করে কবি 'শেষলেখা' পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন তাঁরগ অনুভবঋদ্ধ প্রত্যয়দীপ্ত বাণী। রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণের চেষ্টা নয়, শুধু ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াসী আমরা। অসীম যেমন সীমার বাঁধনে ধরা পড়ার নয়, রবীন্দ্র কাব্যাকাশের অসীম দ্যোতনা তেমনই সংকীর্ণ পরিধিতে বাঁধার নয়।

তাঁর বিশাল কাব্যসম্ভভারের কালানুক্রমিক একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের রূপরেখা এখানে দেওয়া হ'ল।

তাঁর "বহুকালের প্রেয়সী' ছেলেবেলাকার, বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী" কবিতাই যে তাঁর আজন্মসাধনার ধন, তাঁর জীবনসাধনা—তার ক্রমাভিব্যক্ত পরিচয় এখানে সূত্রাকারে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

১.৪ রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের কাছে পরমবিস্ময়। তাঁর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার মধ্যেই আছে সুরের ব্যঞ্জনা। তাঁর বিশাল ব্যপ্ত জীবনে বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্ভারে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্য ভুবন। এই বিচিত্র ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর রচিত গান।

জীবনস্মৃতির আত্মকথনে জেনেছি তাঁর পরিবারে অশৈশব সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তারই সার্থক প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতে দেখেছি। সারা জীবনে নানা পর্বে, নানা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন, নিজে গান গেয়েছেন। নানা পর্যায় উপপর্যায়ে বিন্যস্ত তাঁর রচিত আড়াই হাজার গানের সম্ভভার পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্য সঙ্গীতের পরম সমাদরের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন গড়ে উঠেছে লৌকিক, বিদেশী ও মার্গসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গমে। অবশ্যই সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অনুভব মিলে তৈরি হ'ল রবীন্দ্রসঙ্গীত, যা এতদিনের প্রচলিত সঙ্গীতধারায় এক নতুন সংযোজন। গানের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির ব্যঞ্জনা, যে মুক্তি উদার প্রকৃতিতে, আকাশে বাতাসে আলোয় ধূলায় ব্যপ্ত। তাই তিনি বলেছেন যে কথা জিনসটা মানুষের আরগ গান প্রকৃতির। কথা প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, গান প্রয়োজনাতীতের আনন্দ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি কুমুদিনীকে তার দাদা বিপ্রদাস বলছে—

> "সংসারে ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়, চিরকালটা থাকে আড়ালে, গানে
> চিরকালটাই আসে সামনে ক্ষুদ্রকালটা যা. তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়"

রবীন্দ্রসঙ্গীত এই মানসমুক্তির গান। তাঁর গানের সংকলন গীতবিতানের পর্যায় ভাগ এই রকম—পূজা, স্বদেশ, প্রকৃতি প্রেম, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। প্রতিটি পর্যায় াবার বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত।

আবার প্রকৃতিগতভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি ভাগ—মৌলিক ও ভাঙা গান। ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ যেসব গান নিজে বা অন্য কারুর কাছে শুনে সেগুলির সুর কাঠামো অনেকটাই রেখে তাতে বাণী বসিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকেই বলে ভাঙা গান। এরমধ্যে আছে প্রথমজীবনে শোনা বিলিতি গান, হিন্দী শাস্ত্রীয় গান এবং মধ্যবয়সে বাংলা গ্রাম্য গান। লোকসঙ্গীত ভেঙেই সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্বদেশসঙ্গীত। বাউল গান, ভাটিয়ালী গান, সারী গানের সুরের প্রভাব রয়ে গেছে এরমধ্যে। আবার প্রথমজীবনে পাশ্চাত্য আইরিশ মেলোডির অনসুরণে গড়ে উঠেছিল গীতিনাট্যের গানের মালা।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানও বিশষভাবে উল্লেখ্য। কাব্যনাট্য বা কমেডি জাতীয় নাটক (রাজা ও রাণী, চিরচকুমার সভা) ছাড়া অপেরাধর্মী মায়ার খেলা বা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যগুলিতে সঙ্গীতের উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর গানের সর্বোত্তম প্রকাশ সম্ভবত তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিতে ঘটেছে। রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা, অরূপরতন, অচলায়তনে অসামান্য ব্যঞ্জনায় গানগুলি মানসমুক্তির গান হ'য়ে ওঠে।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার সঙ্গে নানা উপলক্ষে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে—আনন্দে, অনুষ্ঠানে, উৎসবে, শোকে, দুঃখে বেদনায়, বিরহে, স্মরণে রবীন্দ্রসঙ্গীত অপরিহার্য। তাঁর গানে স্বদেশচেতনার উদ্দীপনা আছে, আছে প্রকৃতির রূপবিভোরতার মুগ্ধতা, আছে প্রেমের মাধুরী, আছে পূজার নিবিড় নিবেদন। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধন—যা রবীন্দ্রসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য—তা তাঁর গানের বাণীতেই সার্থকভাবে উচ্চারিত। তাই তিনিই বলতে পারেন—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাবো
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো নাগো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো"

১.৫ অনুশীলনী

১। রবীন্দ্র কাব্যের আদিপর্বের বৈশিষ্ট্য কী?
২। রবীন্দ্রকাব্যের দ্বিতীয়পর্বের অন্তর্গত কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
৩। 'সোনারতরী' কাব্যের কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার পরিচয় দিয়ে এই পর্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪। 'চিতার' কাব্যের জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতাগুলির তাৎপর্য নির্দেশ করুন।
৫। 'খেয়া' কাব্য থেকে শুরু হয়ে গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতাগুলির অধ্যাত্মভাবনার পরিচয় দিন।
৬। 'বলাকা' কাব্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।
৭। 'কবির শেষ রাগিণীর বীণ' পুরবী কাব্যে কিভাবে ধ্বনিত হ'য়েছে তার পরিচয় দিন।
৮। 'পুনশ্চ'কে রবীন্দ্রসাহিত্যে পালাবদলের কাব্য বলার কারণ কী?
৯। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
১০। রবীন্দ্রকাব্য ধারায় মৃত্যুচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করুন।
১১। রবীন্দ্রকাব্য কালিদাসের প্রভাব প্রসঙ্গে 'কল্পনা' কাব্যের কয়েকটি কবিতার পরিচয় দিন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. **রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—১৩৯২।**
২. **রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—নীহাররঞ্জন রায়—প্রকাশকাল ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।**
৩. **রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস।**
৪. **পান্থজনের সখা—আবু সয়ীদ আইয়ুব (দে'জ)।**
৫. **কবি রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু (দে'জ)—১৯৮০।**
৬. **রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়—শুদ্ধসত্ত্ব বসু।**
৭. **রবীন্দ্র কবিতালোক—জ্যোতির্ময় ঘোষ (দেজ পাবলিশিং)।**
৮. **রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা ঃ মানবিক প্রেম বনাম তাত্ত্বিকতা—মীনাক্ষী সিংহ (পুস্তক বিপনি)১৯৯৫।**
৯. **রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।**
১০. **রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী।**

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.